শিশুর শিক্ষায় পরিবারের প্রভাব

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ শেখ

শিশু যে সুপ্ত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তাকে সমাজের যোগ্য ব্যক্তিতে পরিণত করাই শিক্ষার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত পন্থায় সমাজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্যেই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। তাই বিদ্যালয়কেই শিশুর শিক্ষার একমাত্র স্থান বলে অনেকেই মনে করেন। শিশুর শিক্ষায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই—কিন্তু মনে রাখতে হবে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যে কেবল বিদ্যালয় যথেষ্ট নয়।

শিশু যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে এবং লালিত পালিত হয় সেই পরিবারের প্রভাব তার জীবন গঠনে অনন্য ভূমিকা পালন করে। সাধারণত পাঁচ-ছয় বছর বয়স হলে তবেই শিশু পরিবারের গন্ডী পেরিয়ে বিদ্যালয়ের বৃহত্তর পরিবেশের সম্মুখীন হয়। শিশুর জীবনের এই প্রথম পাঁচ-ছয় বছর সময়ে পরিবারই হচ্ছে তার একমাত্র সামাজিক পরিমন্ডল। শৈশবের এই সময় খুবই মূল্যবান। কারণ জীবনের এই স্তরে শিশু খুব সহজেই প্রভাবিত হয়। পরবর্তী সময়ে স্কুলে ভর্তি হওয়ার ফলে শিশু ক্রমশঃ বাইরের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে বটে তথাপি বেশ কিছুদিন যাবৎ পরিবারই থাকে তার পরিবেশের কেন্দ্রবিন্দু।

পরিবার শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাগার। জন্মের পর অসহায় মানব শিশুর প্রধান অবলম্বন তার মাতা পিতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য। তাদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় পরিবেশগত নানা ধরনের জিনিসপত্রের সঙ্গে শিশুর প্রথম পরিচয় ঘটে। গৃহপালিত পশু-পাখি, ঘরের আসবাবপত্র এবং প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় নানা রকম উপকরণ তখন শিশুর প্রধান শিক্ষনীয় বিষয় হয়ে ওঠে।

পরিবারেই শিশুর ব্যক্তি সত্তার ভিত্তি স্থাপিত হয়। পিতা-মাতা এবং পরিবার পরিজনের কথা-বার্তা আচার-ব্যবহার, ধর্ম-সংস্কার, ইত্যাদি শিশুর উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে এবং শিশুর কোমল মনে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে। পরিবারের পরিবেশেই শিশুর স্নেহ, ভালবাসা, মায়া-মমতা প্রভৃতি গুণাবলী ক্রমশঃ বিকশিত হতে থাকে। উদারতা-সংকীর্ণতা, বিবেচনাবোধ, স্বার্থপরতা, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, পরিশ্রম-অলসতা, স্নেহ-হিংসা ইত্যাদির পার্থক্য শিশু পরিবার থেকেই শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায়। পরিবারেই শিশু কথা বলতে শেখে মাতৃভাষার মাধ্যমে। পরিবারের প্রভাবের ফলেই শিশুর শব্দের ভান্ডার গড়ে ওঠে। শৈশবে পরিবারে যে শব্দ ভান্ডার শিশু আয়ত্ত করে তার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে তার ভবিষ্যৎ প্রকাশ ক্ষমতা।

শিশুর মানসিক গুণাবলীর স্বচ্ছন্দ ও সুষম বিকাশের জন্য প্রয়োজন সহানুভূতিশীল, সুস্থ, সুন্দর অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ; এ সময় শিশুর মধ্যে যে আবেগের সৃষ্টি হয় তা প্রশমনের জন্য তাকে আদর-যত্নে লালন-পালন করা দরকার। তা না হলে তার মানসিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার আশংকা থাকে। ফলে তার ব্যক্তিসত্তা বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে পিতা-মাতার অনাদর, অবহেলা শিশুকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। সে অসামাজিক, মারমুখী, ঈর্ষাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর হয়, আবার পিতামাতার অমনোযোগিতার ফলে সহজেই চুরি, স্কুল-পালানো প্রভৃতি কু-অভ্যাস ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। পারিবারিক কঠোরতার ফলে শিশু মিথ্যাবাদী ও ভীরু হয়। কঠোরতার হাত থেকে মুক্তি পেতে সে অস্বাভাবিক কোন বিকল্প পন্থা অবলম্বন করে। অপরদিকে, মাত্রার অতিরিক্ত আদর-যত্ন ছেলেমেয়েদের অসামাজিক ও একগুঁয়ে করে তোলে।

প্রশ্রয় না দিয়ে ছেলেমেয়েদের যতদূর সম্ভব স্নেহ, নিরাপত্তা, আদর-যত্ন দিয়ে লালন-পালন করা দরকার। মাত্রাতিরিক্ত আদর যেমন শিশুর অপরিসীম ক্ষতি করে তেমনি তার প্রতি অহেতুক অবজ্ঞার ভাব দেখানোও উচিত নয়। পরিবারে শিশুকে যথোপযুক্ত স্থান দিতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ গন্ডীর মধ্যে থেকে কাজ করতে ভালবাসে। তাই গৃহে শিশুর কাজকর্মের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। এর ফলে পরিবারের পরস্পরের মধ্যে সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে উঠবে। যে শিশু পিতামাতার নিশ্চিত নির্ভরতায় বেড়ে ওঠে—সে পরবর্তীকালে নিজেকে অধিক নিরাপদ মনে করে।

পরিবেশের প্রভাব পরবর্তীকালে ছাত্রের স্কুল-জীবনে সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। দু'জন ছাত্র একই শ্রেণীতে একই শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভ করে, একই পাঠসূচী অনুসরণ এবং অভিন্ন পাঠ অনুশীলন করে, তথাপি, তাদের উভয়ের সাধারণ জ্ঞান, আগ্রহ, কথা-বার্তা, নৈতিকতা ইত্যাদিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য ধরা পড়ে। ভিন্ন গৃহ-পরিবেশই নিঃসন্দেহে এই পার্থক্যের প্রধান নিয়ামক।